চন্দন চিতা

মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হ'ল। এতক্ষণ পাইন গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দুরন্ত হাওয়া দাপাদাপি করছিল। তারই আওয়াজ আসছিল শোঁ শোঁ করে। এখন সবকিছু ছাপিয়ে ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টির শব্দ শুধু। অ্যাসবেস্টসের চালের উপর জলের ধারা তো নয়, যেন ইট-পাটকেল বর্ষণ করছে কোন অশরীরী আত্মা।

সুমনা আস্তে একবার ডাকলো, "এই রমাদি, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?"

ওপাশের খাটে আপাদমস্তক কম্বল ঢাকা মানুষটির কাছ থেকে কোনও সাড়া এলো না। সুমনা বিছানার উপর উঠে বসলো বালিশে হেলান দিয়ে। অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ে রইলো কাচের জানলার দিকে। শার্সির গা বেয়ে বৃষ্টির জল পড়ছে। জানলার বাইরের পৃথিবী আধো-অন্ধকারে যেন এক অচেনা আগন্তুকের আকৃতি নিয়েছে, যার হাবেভাবে অজানা আশঙ্কার ইঙ্গিত। অন্ধকারে গাটা কেমন ছম্‌ছম্‌ করে ওঠে সুমনার। সম্‌পূর্ণ অচেনা জায়গায় এভাবে হুট করে চলে আসা উচিত হয়নি তাদের। খেয়ালী ইচ্ছেগুলোয় লাগাম টানার বয়স হয়েছে এখন। তাছাড়া যা দিনকাল পড়েছে !

সুমনা দিল্লীতে একটা কলেজে লেকচারার। রমাদিও। চাকরি সূত্রেই আলাপ ওদের। বল্গাছাড়া স্বাধীন জীবন। ছুটি-ছাটা পেলেই বেরিয়ে পড়ে দেশভ্রমণের নেশায়। পুজোর ছুটিতে কলকাতায় এসেছিল। হঠাৎ রমাদির খেয়াল চাপলো শিলং দেখার। ওঁর এক ভাইপো নাকি ওখানে চাকরি করে। সম্‌প্রতি বিয়ে-থাওয়া করে সংসারী হয়েছে এবং অনভিজ্ঞ নতুন-সংসারীর বেপরোয়া উৎসাহে ঢালাও নিমন্ত্রণ পাঠাচ্ছে জনে জনে। অতএব এ যাত্রা তার কুটিরে অনায়াসে কিছুদিন কাটিয়ে আসতে পারে ওরা। সুমনা তো শোনামাত্র রাজী। একটা টেলিগ্রাম ঠুকে দিয়ে ট্রেনে

চড়ে বসলো দু'জনে। অবশ্য তার আগে কলকাতার বাজার থেকে বাছা বাছা কিছু উপঢৌকন সংগ্রহ করলো নব দম্পতির জন্যে। গৌহাটিতে নেমে বাসের টিকিটের জন্যে লম্বা কিউ দিয়ে টিকিট জোগাড় করে বাসে চড়লো ওরা।

পাহাড়ী ঘোরাপথে এঁকে বেঁকে বাস চলেছে, দু'দিকে নয়নাভিরাম দৃশ্য। কিন্তু দৃশ্য দেখবে কি, সারা শরীর পাক দিচ্ছে তখন। পেটের নাড়িভুড়ি গুলিয়ে উঠছে যেন। মাঝ-রাস্তায় কিছুক্ষণের জন্যে বাস থামলো। যাত্রীরা জলযোগের যোগাড়ে নামলো, মহিলারা হন্যে হয়ে ছুটলেন বাথরুমের খোঁজে। রমাদি একটা দোকানে ঢুকে জল দিয়ে বেশ করে চোখমুখ ধুলো। সুমনাও ওর দেখাদেখি তাই করলো। ভীষণ বমি পাচ্ছিল তার। কিছু খাবার কিনে নিলো। এখন না খাক, সঙ্গে থাক।

বাস যখন শিলং-এ এসে পৌঁছলো, সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। বাস-স্টপে ভাইপো সঞ্জয়কে না পেয়ে মুষড়ে পড়লো রমাদি। বাসের ধকলে শরীর যেন ভেঙে পড়ছে। কিন্তু কি আর করা যায়, অগত্যা একটা ট্যাক্সির শরণ নিলো ওরা। ওদের দুঃখের আকাশে তখনো কলির সন্ধ্যে। 'লাইমুখরা'য় এসে ঠিকানা খুঁজে সঞ্জয়ের বাড়ি পৌঁছে দেখে বাড়ির দরজায় তালা ঝুলছে। দু'জনে দাঁড়িয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো, ভিতরে ভিতরে দু'জনেরই প্রায় ডাক ছেড়ে কাঁদার মত অবস্থা তখন। ব্যাপার-স্যাপার দেখে খাসিয়া ড্রাইভার দয়াপরবশ হয়ে পাশের বাড়ির দরজায় গিয়ে হাঁক পাড়লো। গৃহকর্তা বেরিয়ে এলেন, গৃহকর্ত্রীও। মনে হল জানলা দিয়ে এদেরই কার্যকলাপ দেখছিলেন এতক্ষণ। সঞ্জয়ের খবর শোনালেন। সে নাকি বউকে তেজপুরে তার বাপের বাড়ি নিয়ে গেছে, লক্ষ্মীপুজোর পরে ফিরবে। ওদের টেলিগ্রাম আসার আগেই রওনা দিয়েছে, কাজেই ওদের থাকার কোনও ব্যবস্থা করে যায়নি সে।

রমাদির মুখ দেখে মায়া লাগছিল সুমনার। মনে মনে সবকিছুর জন্যে নিজেকেই দায়ী করছে রমাদি। বিশেষ করে সুমনাকে এই অবস্থার মধ্যে এনে ফেলার জন্যে খুবই লজ্জিত বোধ করছিল সে। সর্বোপরি সঞ্জয় তারই আত্মীয়। অবশ্য দোষ সঞ্জয়ের নয়, দোষ তাদের হঠকারিতার। কিন্তু এখন আর সে সব ভেবে লাভ!

সুমনা সপ্রতিভ কন্ঠে বলে, "এখানে কোন ভাল হোটেলের খবর দিতে পারেন? মানে মহিলারা নিরাপদে থাকতে পারেন যেখানে।"

ভদ্রলোক আমতা আমতা করেন, "এই রাত্তিরবেলা !"

তাঁর স্ত্রী বললেন, "এত রাত্রে আবার হোটেলে গিয়ে উঠবেন? তার চেয়ে আজকের রাতটা না হয় এখানে থেকে যান, কাল যাহোক একটা ব্যবস্থা হবে।"

ক্রমে জানা গেল সঞ্জয়রা বাড়ির চাবি এদের কাছেই দিয়ে গেছে বাড়ির হেফাজতের জন্যে। নইলে যেমন দিন-কাল পড়েছে, চোর এসে হয়তো তলে তলে সবকিছু সাফ করে দিয়ে যাবে, দরজার সামনে আস্ত তালাটা টাঙানো থাকবে শুধু।

শেষ অবধি ওরা হাজারিকা দম্পতির পরামর্শই মেনে নিলো। সঞ্জয়দের বাড়িতে শোবার ব্যবস্থা হল এদের। ভদ্রমহিলা রাতের খাবারের কথা জিজ্ঞেস করায় ওরা বললো খাবার সঙ্গেই আছে। তালা খুলে ওদের শোবার ঘর দেখিয়ে তারপর শুভরাত্রি জানিয়ে কর্তা-গিন্নী স্ব-গৃহে প্রস্থান করলেন। ওরা রাস্তায় কেনা খাবারের প্যাকেট খুলে দেখে লুচি তরকারী সব চটকে ঘ্যাঁট হয়ে গেছে। কোনমতে তাই সামান্য মুখে দিয়ে শুয়ে পড়লো।

ক্লান্তিতে সারা শরীর ভেঙে পড়ছে, শোয়ামাত্র অঘোর ঘুমে তলিয়ে যাবার কথা। কিন্তু সুমনার চোখে ঘুম নেই। রমাদিকে ডেকে সাড়া পেল না। বাইরে এতক্ষণ শোঁ-শোঁ করে হাওয়ার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, এখন শুধু ঝম্-ঝম্ করে বৃষ্টি। হঠাৎ জানলার দিকে নজর যেতেই বুকটা ধড়াস্ করে উঠলো তার। পুরনো আমলের দোতলা বাড়ি। জানলাগুলো প্রায় দরজার সাইজ। নীচের অংশে কাঠের খড়খড়ি লাগানো, উপরের অর্ধেকটা কাচ। জানলার ওপাশে সরু কার্নিশের উপর একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। মানুষটার শরীর এবং শার্সির কাচের মধ্যে এতটুকু ফাঁক নেই। শার্সিতে মুখ সাঁটিয়ে এই দিকেই তাকিয়ে আছে লোকটা। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকালো। সাদা ধবধবে আলো খেলে গেল মুহূর্তের জন্যে। সুমনার গলা থেকে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ফুটে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে ওর গায়ে ঠেলা দিয়ে রমাদি বললো, "এই, চুপ।"

চেয়ে দেখে রমাদি কখন উঠে এসেছে। ওর গা ঘেঁষে বসলো রমাদি। অন্ধকারে রমাদির একটা হাত নিজের হাতে চেপে ধরলো সুমনা। উঃ! কি ঠাণ্ডা রমাদির হাত। সুমনার নিজের হাত ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে।

কাঁপা কাঁপা গলায় ফিস্‌ফিস্‌ করে বললো, "রমাদি, দু'জনে মিলে চিৎকার করে লোক ডাকি।"

রমাদি ফিসফিসিয়ে বললো, "না, চুপ করে থাক। ও ভিতরে আসবে না। চলে যাবে।"

কয়েক মুহূর্ত পরে সত্যিই জানলার সামনে থেকে ছায়ামূর্তি অন্তর্হিত হয়ে গেল।

এর ক'দিন পরে আসাম মেলের একটি কামরায় বসে রমাদির মুখ থেকে যে কাহিনী শুনলো সুমনা তা এই :-

"প্রায় বিশ বছর আগের কথা। আই.এ. পাশ করে পাটনা কলেজে থার্ড ইয়ারে ভর্তি হয়েছি। সেশন শুরু হতে মাসখানেক বাকি তখনো। বাবা হঠাৎ তাঁদের গ্রামে যেতে মনস্থ করলেন। আমি জীবনে কখনও গ্রাম দেখিনি।

বাবাকে বললাম, "আমিও যাবো তোমাদের সঙ্গে।"

বাবা বললেন, "দূর পাগলি, সে কি একটা যাওয়ার জায়গা নাকি? সেখানে আছে কি যে যাবি? দু'দিনও টিকতে পারবি না সেখানে।"

কি জানি কেমন একটা জেদ চেপে গেল আমার। শেষ অবধি বাবা রাজী হলেন। ঠিক হল বাবা, মা ও আমি তিনজনেই যাব।

"বাবারও গ্রামের সঙ্গে খুব একটা যোগাযোগ নেই। আমার ঠাকুরদা গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছিলেন। মজঃফরপুরে হেডমাস্টার ছিলেন তিনি। বাবা ডাক্তারী পাস করে ছাপরায় প্র্যাকটিস্‌ শুরু করলেন। ক্রমে ভাল পসার হল, সেখানেই রয়ে গেলেন। গ্রামে বাবার দূর সম্পর্কের এক খুড়ো ও তাঁর ছেলেমেয়েরা থাকতো শুনেছি। যা জমিজমা ছিল তার আয়েই চলতো তাদের। গ্রামেই তাদের জন্ম-কর্ম যা কিছু। সাসারাম থেকে ছোট লাইন ধরে ঘন্টা তিনেকের রাস্তা। স্টেশনে নেমে আরও মাইল দেড়েক হাঁটা পথে গেলে পর তবে গিয়ে চান্দেরি গ্রামে পৌঁছনো যায়। জেদ করে

চলে এসে যে বোকামী করেছি, গল্পের বইয়ের গ্রাম ও সত্যিকারের গ্রামে যে তফাৎ অনেক, পথেই তা খানিকটা টের পেয়েছিলাম। পুরোপুরি মালুম হল সেখানে পৌঁছে।

"আমার সাজপোশাক, আচার-ব্যবহার, সবকিছুই খাপছাড়া সেখানে। গ্রামের বিহারী মেয়েদের বারো তেরো বছরে বিয়ে হয়ে যায়। আর যাদের অভিভাবকরা তখনো পাত্র যোগাড় করে উঠতে পারে না, সে সব মেয়েরা নিজেদের সযত্নে লুকিয়ে রাখে লোকচক্ষুর আড়ালে। পিসিমা কাকীমারা আমায় নিয়ে বেশ বিব্রত হয়ে পড়লেন। এমনকি আমার মা-বাবাও।

"নিজেরা আধুনিক হলেও মা-বাবা চাননি যে আমাকে কেন্দ্র করে গ্রামের লোকেদের আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের সম্বন্ধে কোনও খারাপ ধারণা হোক। বিশেষ করে এইসব মানুষের সঙ্গেই যখন থাকতে হবে ওদের। সব দেখেশুনে কান্না পাচ্ছিল আমার। হায়রে, কোথায় ভেবেছিলাম ঘিঞ্জি শহর ছেড়ে খোলামেলা জায়গায় ছুটোছুটি, হুড়োহুড়ি করে কাটাবো কদিন, তা নয় অষ্টপ্রহর ঘরের কোণে বন্দী হয়ে থাকো।

"বাবা চান্দেরিতে একটা পোল্ট্রি খোলার সম্ভাবনা সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে এসেছিলেন। আর ক'বছর পর ডাক্তারীর পাট তুলে দিয়ে গ্রামে এসে বসার সাধ মাঝে মাঝে তাঁর মনে উঁকি-ঝুঁকি মারতো। ইচ্ছেটা শেষ অবধি পূর্ণ করার মত জোরালো হয়ে উঠবে কিনা সেটা তখনো অনুমানসাপেক্ষ। তবু প্রস্তাবটা খতিয়ে দেখবার ইচ্ছে তাঁর। অর্থাৎ গ্রামে কটা দিন থাকতেই হবে আমাদের, তক্ষুনি ফেরা যাবে না। অবশ্য নিজেকে যথাসম্ভব স্থানীয় লোকেদের কৌতুহলী দৃষ্টির আড়ালে রাখা ছাড়া আর কোনও কড়াকড়ি ছিল না আমার উপর। বরং খাতির-যত্নে সেটা পুষিয়ে দিতে চাইতো সবাই। ঘরের মধ্যে চলতো চুটিয়ে আড্ডা। নানা বয়সের ছেলে মেয়ের ভিড় বাড়িতে।

"মণি পিসিমার ছেলে চন্দন আমার থেকে বছর দু'য়েকের বড়। ম্যাট্রিক ফেল করে আর পড়ে নি। এ ছাড়া ছিল নন্তু, মীনা, সুধা, শঙ্কর, বিলু। কখনো তাস খেলা হত, কখনো ক্যারাম অথবা লুডো এবং সেই

সঙ্গে সর্বক্ষণ খই ফুটতো মুখে।

"আমাদের ছাপরা ফেরার আগের দিনের কথা। সেদিন রাত্রে মিশিরজীদের ওখানে বাড়ির সবার নেমন্তন্ন। মিশিরজী এ তল্লাটের একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি। সম্প্রতি তাঁর একটি নাতি হয়েছে, তারই নামকরণ হবে। আমি ছোট কাকীমার সঙ্গে বাড়িতে রইলাম। চন্দনের দু'দিন থেকে জ্বর বলে সেও মিশিরজীর বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে যেতে পারলো না। কাকীমা রান্নাঘরে ব্যস্ত। আমি পুরনো একখানা শারদীয় পত্রিকা নিয়ে বসেছি।

"আশাপূর্ণা দেবীর একটা গল্প খুঁজে পেয়ে তাতেই নিমগ্ন হয়ে গেছি; এমন সময় হঠাৎ ডাক শুনলাম, 'রমা!'

তাকিয়ে দেখি চন্দন কখন বিছানায় উঠে বসেছে। দু'চোখ লাল করে চেয়ে আছে।

কাছে গিয়ে বললাম, 'কি হয়েছে চন্দন, কাকীমাকে ডাকবো?'

ও বললো, 'না, তুমি এখানে এসে বসো।'

আমি ওর কাছে যেতে ও দু'হাতে আমার একটা হাত চেপে ধরে তার উপর নিজের মুখ রাখলো। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে ওর গা।

ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'চন্দন, তোমার জ্বর বেড়েছে। তুমি শুয়ে থাকো। আমি কাকীমাকে ডেকে আনি।'

চন্দন বললো, 'না, তুমি যেয়ো না। তুমি আমার কাছ থেকে চলে গেলে আমি মরে যাবো।'

"কি করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। বাড়িতে অন্য কেউ নেই। উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘর। এখান থেকে চেঁচিয়ে ডাকলে কাকীমা শুনতে পাবে কিনা কে জানে। তাছাড়া কাকীমা এসেই বা কি করবে। বাবা ডাক্তার, কিন্তু বাবা তো মিশিরজীর বাড়ি নেমন্তন্ন খাচ্ছে এখন। এমন কেউ নেই যাকে দিয়ে খবর পাঠানো যায়।

চন্দন উত্তেজিত হয়ে বলে চলেছে, 'জানি তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছো না। কিন্তু দেখো আমি যা বলছি তা সত্যি হয় কিনা। তোমায়

ছেড়ে আমি কিছুতেই বাঁচবো না।'

আমি ওকে শান্ত করার জন্যে বললাম, 'বিশ্বাস করবো না কেন। এই তো আমি তোমার কাছেই রয়েছি। তুমি শুয়ে পড়ো চন্দন। তোমার জ্বর বেড়ে গেলে আমার ভীষণ কষ্ট হবে। শুয়ে পড়ো লক্ষ্মীটি।'

ও আমার কথা শুনে শুয়ে পড়লো। আমি ওর পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। খানিক পরেই ঘুমিয়ে পড়লো ও।

"পরদিন ভোরের ট্রেনে ছাপরা রওনা হলাম আমরা। আসার আগে চন্দনের কাছে আর যাইনি। কি জানি, জ্বরের ঘোরে যদি ওই সব কথা সবার সামনে বলতে শুরু করে ! আবার হাঁটাপথে স্টেশন। রাস্তায় নেমে বুকের মাঝে কাঁটার মত একটা কথাই বাজছিল শুধু - আহা, চন্দনের সঙ্গে দেখা করে বিদায় জানিয়ে আসা হল না। কিন্তু তখন আর ফেরা যায় না, ফিরে যাওয়ার কোন অজুহাতই যে নেই। বারে বারে পিছিয়ে পড়ছিলাম।

বাবা-মা তাড়া দিচ্ছিলেন, 'রমা, আর একটু পা চালা মা, ট্রেনের দেরী নেই।'

"ছাপরা ফিরে কদিন পরেই পাটনা পাড়ি দিলাম। নতুন ক্লাশের নতুন পড়া, হস্টেল-কলেজে কত নতুন বন্ধু। সবকিছুর মাঝেও কেন জানি এক আনমনা বিষাদে সারা মন হাহাকার করে ওঠে। কতবার মনে হত চন্দনকে একটা চিঠি যদি লিখতে পারতাম, সামান্য এক লাইন কুশল প্রশ্ন শুধু। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই সামান্য ঘটনা থেকে যে কি অপ্রিয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে, সেই কথা মনে করে সভয়ে পিছিয়ে আসতাম।

"এমনি করে একটা বছর কেটে গেল। এরপর পুজোর ছুটিতে বাড়ি এসে শুনলাম মণি পিসিমা নাকি কয়েকদিনের জন্যে আসছেন ব্লাড-প্রেসারের চিকিৎসা করাতে। মনে মনে ভগবানের শ্রীচরণে প্রণাম জানিয়ে বললাম, 'হে ঠাকুর, তুমি আছ। এত বছরে পিসিমার কোনদিন ছাপরা আসার প্রয়োজন পড়েনি। আজ হঠাৎ তার রক্তচাপ বৃদ্ধি - এ আমারই অন্তরাত্মার প্রার্থনার উত্তর। পিসিমা এলে কি চন্দনও তাঁর সঙ্গে আসবে না?'

"দিনগুলো যেন প্রজাপতির পাখায় ভর দিয়ে উড়ে যেতে চায়। তর আর সয় না। কবে আসবে সে দিন? কবে? আমার মনের কথা কি আমার মনের মধ্যে সযত্নে আগল টেনে সুরক্ষিত রাখতে পেরেছিলাম? নাকি নির্বুদ্ধি হৃদয়ের সচকিত কম্পন ঢেউ তুলেছিল আকাশে, বাতাসে, সর্ব চরাচরে ! 'নড়িলে হীরক যথা পড়ে ঠিকরিয়া আলোক তাহার।'

"মা একদিন আমাকে কাছে ডাকলেন। চেষ্টাকৃত নির্লিপ্ত স্বরে বললেন, 'রমা, তোকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। শোন্, তোর পিসিমা এলে চন্দনের কথা যেন জিজ্ঞেস করিস না।'

অবাক হয়ে বললাম, 'কেন মা?'

মা আমার মুখের উপর থেকে দু'চোখ সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'সে নেই।'"

এই পর্যন্ত বলে রমাদি থামলো। দু'চোখের দৃষ্টি তার অতীতের গভীরে

নিমগ্ন। যেন হৃদয়ের অতলে হারিয়ে যাওয়া অমূল্য রতন হাতড়ে ফিরছে কোন আশাহত ডুবুরী।

একটু থেমে আবার বললো, "জানি না পরকাল বলে কিছু আছে কিনা। শুধু আমার নিজের একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলছি তোমায়। গত বিশ বছরে চন্দনের আত্মা বহুবার এসেছে আমার কাছে। বর্ষা রাতের অন্ধকারে যখন সবকিছু ছাপিয়ে কানে আসে শুধু ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টির আওয়াজ, সেই দুর্যোগের রাতে জানলার ওপাশে দাঁড়িয়ে চন্দন জ্বর-তপ্ত উদ্‌ভ্রান্ত চোখে চেয়ে থাকে। মাঝে মাঝে ভাবতাম, এ বুঝি আমারই মনের বিভ্রম শুধু, কল্পনার বিকার। আশ্চর্য, সেদিন চন্দনের আত্মা তোমার চোখেও ধরা দিল ----।"